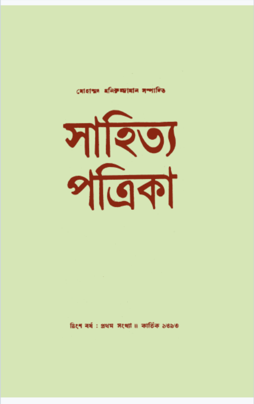

Vol. 30 | No. 1 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতা

Volume	30
Issue	1
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মাহবুব সাদিক
Published online	October 30, 1986
DOI	10.62328/sp.v30i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i1.2
Pages	69-96
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতা

মাহবুব সাদিক

বিপ্লবদীর্ণ এক শান্তিহীন ও অস্থির পৃথিবীর অধিবাসী কবি অমিয় চক্রবর্তী [জন্ম: ১৯০১—মৃত্যু: ১৯৮৬]। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অস্থির ও জটিল যন্ত্রবিশ্বের দ্রুত পরিবর্তমান পট-পরিসরে তাঁর প্রখর চৈতন্য কবিতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আধুনিক মানুষের প্রমিতিহীনতা ও অবিশ্বাস, জটিলতা দ্বন্দ্বজর্জর মানসের রূপকার হয়েও কবিতায় ও জীবনে সঙ্গতির অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলো এই কবিসত্তা। তীক্ষ্ণভাবে সচেতন তাঁর মনোলোক এবং সেখানে জটিলতর ভঙ্গিতে রূপায়িত হয়ে ওঠে আধুনিক আন্তর্জাতিক বিশ্বের মানব-মানস। অমিয় চক্রবর্তীর 'অনুভূতির ব্যাপ্তি আন্তর্দেশিক, এমনকি আন্তর্জাগতিক।[১] তাঁর কবিতার বিশিষ্ট প্রকরণকলার আপাতপ্রশান্তির অন্তরালে লুকিয়ে আছে তীব্র আন্দোলন। সচেতন পাঠকের গভীর গহনে প্রবিষ্ট হয় তার পংক্তি-মালা এবং তার গাঢ় চৈতন্যের সান্নিধ্যে এক নতুনতর বোধি সেখানে মানবিক বিভা জ্বেলে দেয়। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'সহজ প্রত্যহের পটে বৈদ্যুতিক বোধি জ্ব'লে ওঠে।'[২]

এই বোধের অভিজ্ঞতা পাঠক অনিবার্যভাবেই অনুভব করবেন অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতায়। দ্বন্দ্বজর্জর ও অস্থির অনিকেত আধুনিক মানসের অনিবার্য বেদনা এইসব কবিতায় অমোঘ হয়ে উঠেছে। টুকরো ছবি, ভাঙা রূপচিত্র, দুরূহ অন্বয় এবং প্রতীকী শব্দ ও বাক্যাংশ মিলেমিশে তাঁর কবিতা এমন এক বিশিষ্টতা অর্জন করে, যার রসগ্রহণ পাঠকের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও সচেতন মনষ্ক্রিয়ার অপেক্ষা রাখে। অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেও এ-কথা সমান প্রযোজ্য। গাঢ়বদ্ধ অনুভব ও অনুভূতিপুঞ্জ সেখানে বেদনার ঘন নিঃশ্বাসে দুলে ওঠে।

আবহমান বাংলা প্রেমের কবিতা থেকে অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতা নতুন কোন রূপ ধ'রে উপস্থিত হয়নি। পূর্বতন ঐতিহ্য তাঁর

কবিতায়ও স্বীকৃত। তবু প্রকরণকলার বিশিষ্টতা ও বিষয়বিন্যাসের স্বাতন্ত্র্যে তা পূর্ববর্তী ও সমকালীনদের কবিতা থেকে কিছুটা আলাদা। সমকালীন ও পূর্ববর্তী কবিদের নায়ক-নায়িকারা কখনো কখনো সোনালি চুল ও নীল চোখ নিয়ে বৈদেশী রূপ ধরে উপস্থিত হলেও অধিকাংশ সময়েই তারা এই দেশেরই অধিবাসী। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর নায়ক-নায়িকারা শুধুমাত্র তাঁর নিজ দেশেরই অধিবাসী নন, তারা সমগ্র বিশ্বের পটভূমিতেই স্থাপিত। বাঙালি নর-নারীর হার্দ্যিক সম্পর্ক-সূত্রে যেমন রচিত হয়েছে প্রেমের কবিতা, তেমনি অধিকাংশ সময়েই তাঁর নায়ক-নায়িকারা আধুনিক বিশ্বেরই নাগরিক।

অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতার বিশিষ্টতা আলোচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এবং অমিয় চক্রবর্তীর সমকালীন কবিদের প্রেম-কবিতা বিষয়ে সম্যক ধারণা নেয়া প্রয়োজন। বিশালব্যাপ্ত জীবনে রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রচুর লিখেছেন, তাঁর রচিত প্রেমের কবিতার সংখ্যাও তেমনি সুপ্রচুর। তাঁর প্রেমের কবিতায় শুদ্ধ বেদনার ঝড় তোলপাড় ক'রে তোলে পাঠকের চেতনাচেতন। বিরহের ভারে নর-নারীর হৃদয় সেখানে যে-রকম ছিন্নপ্রায়, তেমনি পাঠক-হৃদয়ও ছিঁড়ে পড়বার উপক্রম হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতার নায়ক-নায়িকারা বাস্তব পৃথিবীর বাসিন্দা নন, তারা প্রায়ই ভাবলোকের অধিবাসী। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্র-কাব্যোধৃত পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রসাহিত্যে যে-দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তার সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে উভয়ের যোগফলকে যদি পরীর রাজ্য বলা যায়, তাহলে বিস্ময়প্রকাশ অনুচিত।'[৩] রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতাপ্রসঙ্গেও এই উক্তি সত্য, কারণ তাঁর রচিত নায়ক-নায়িকারা বাস্তব বৈশ্বিক পটভূমি-বঞ্চিত, ফলত অতি-মর্ত্যের অধিবাসী। তাঁর নায়কেরা 'সৃষ্টিকালীন প্রত্যূষ'[৪] থেকে প্রেমিকার জন্যে অপেক্ষা করে এবং সেই 'চিরদিবসের প্রেম'[৫] রাশি রাশি ভেঙে পড়ে নায়িকার পায়ে, যে-নায়িকারা প্রায় প্রতিমুহূর্তেই মানবীয় খোলস ছেড়ে দেহের সীমা অতিক্রম করে যায় :

তুমি যেন ওই আকাশ উদার
আমি যেন ওই অসীম পাথার
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দপূর্ণিমা।[৬]

উদার আকাশ এবং অসীম পাথারের সঙ্গে যে নায়ক-নায়িকার উপমা কবি রচনা করেছেন, তাদের মাঝখানে খেলা করে শুধুই আনন্দ-পূর্ণিমা। এজন্যেই অমলেন্দু বসু রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় অবয়বতার (concreteness) অভাব লক্ষ্য করেছেন।[৭] কোন বিশেষ দেশ-কালের অতীত, নভোনীলবিহারী রবীন্দ্রমানস-প্রেমিকাকে ছাড়া পৃথিবীর মানুষেরা অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারে না :

> তোমা ছাড়া কেহ কারে
> বুঝিতে পারি না ভালো কি বাসিতে পারে![৮]

প্রেমের সঙ্গে কাম ও মানবিক ঈর্ষাদ্বন্দ্বের রক্তোদ্বেল সংরাগ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অনুপস্থিত। আর, শুধু বর্তমান জন্মেই নয়, অনাদিকাল থেকে জনমে জনমে এই প্রিয়াকেই ভালবাসবেন ; নিজেদের বিরহ-মিলনে কোটি প্রেমিকের মাঝে খেলা করবেন, এ-রকম প্রতিজ্ঞাও তাঁর কবিতায় ধ্বনিত। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার পাত্র-পাত্রীরা রক্তমাংসের সংক্রাম-বহির্ভূত, কাম ও বাসনামদির বাস্তব নরনারীর অতীত এক ভাবলোকবাসী সত্তা, কাল ও বিশ্বনিরপেক্ষ। 'মানসী' কাব্য-পরবর্তী কবিতায় প্রেমের পাত্রীর দেহ সনাক্ত করা অবশ্য সম্ভব, কিন্তু এই মানবীর সত্তাও সর্বক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়। তাঁর প্রেমিকারা প্রায়ই অর্জন করে বহুমুখী সত্তা, রূপান্তরিত হয় এবং একই কবিতার অন্তরালের 'তুমি' বা 'সে' ক্রমরূপান্তরের ফলে নিজস্ব চারিত্র-বৈশিষ্ট্য হারায়।[৯] নায়িকার এই ক্রমরূপান্তরজনিত কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা অতিবাস্তবতা অর্জন করে এবং বাস্তব পাঠকের মনোযোগ হারায়। বুদ্ধদেব বসু এ-বিষয়ে চমৎকার মন্তব্য করেছেন :

> 'মানসী' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত অনেক কবিতারই লক্ষণ এই দ্বিমুখিতা বা বহুমুখিতা, সেগুলির বিষয় মানবিক অর্থে প্রেম, না ঐশ্বরিক অর্থে ভক্তি, সে বিষয়ে আমরা মনস্থির করতে পারিনা ;[১০]

অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতার নায়িকার এই বহুমুখী রূপ নেই ; তাকে বাস্তব নারীরূপেই চেনা যায়, তার মানবিক গুণাবলীও দুর্লক্ষ্য নয়। বিচিত্র ও ব্যাপক বিশ্বের পটপরিসরে, নানা কবিতায় 'তুমি' বা 'সে'র অন্তরালে তাঁর প্রেমিকার মানবীরূপ নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা

সম্ভব। এই মানবীর জন্য যুগে যুগে জনমে জনমে অপেক্ষাতুর নন প্রেমিকপুরুষ। নানাবিধ জটিলতা, সমস্যা ও সঙ্কট, দ্বন্দ্ব ও অস্তিত্ব-সমস্যার মুখোমুখি অমিয় চক্রবর্তীর প্রেম-কবিতার নায়ক-নায়িকারা অর্জন করে বিশ্বাস্য বাস্তব চরিত্র। বর্তমান বিশ্বের আস্বচ্ছ ও জটিল সমস্যার সংক্রামে তারা বাস্তব মানুষের মতো প্রতিমুহূর্তে তাড়িত হয়। অমিয় চক্রবর্তী তাদের স্থাপন করেছেন বৈশ্বিক পটভূমিতে ; প্রিয়তমা চ'লে গেছে ট্রেনে, দিগন্তে ট্রেনের ধোঁয়া, দূর হুইশিল, অস্ত সূর্যের নিচে স্তব্ধ গির্জেচূড়া—এই পটভূমে 'রক্ত ক্রুশে বিদ্ধ ক্ষণ'-এ দাঁড়িয়ে আছে প্রেমিক। আধুনিক জীবন ও তার জঙ্গম আনুষঙ্গিক পরিপার্শ্বের কিছুই ভুলেন না কবি। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার তীব্র বিরহবেদনার তাপ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতেও বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতার স্বাতন্ত্র্য শুধু এখানেই নয়; দু'জনের পরিবেশ, উপাদান ও বিন্যাসও স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথে যেখানে বিশেষ কোন দেশকালের পরিচয় অস্পষ্ট, সেক্ষেত্রে চক্রবর্তীর নায়ক-নায়িকারা শুধু বাংলাদেশেরই নয়, আন্তর্জাতিক বিশ্বেরই বাস্তব অধিবাসী। বুদ্ধদেব বসু এই দুই কবির স্বাতন্ত্র্য ব্যাখ্যা করেছেন:

> প্রধান কথাটা এই যে রবীন্দ্রনাথের স্থিতিবোধ অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে স্থায়িত্বের ভাব অমিয় চক্রবর্তীতে নেই—কোন আধুনিক কবিতেই তা সম্ভব নয়।··· যে পৃথিবীতে ওরকম স্থায়িত্ব সম্ভব ছিলো সেই পৃথিবী তর্কাতীতভাবে ভেঙে গেছে। আজকের কবি টি. এস. এলিয়ট রাসেল স্কোয়ারের ব্যবসায়ী এবং স্বদেশ-ত্যাগী, রিলকে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ ও লুক্কায়িত ; এমন কি জর্মান কুলীন টমাস মানকে একাধিকবার আটলান্টিক পারাপার করতে হয়। বাসা ভেঙে গেছে মানুষের; বুদ্ধিজীবী মাত্রেই উদ্বাস্তু; 'বাড়ি' নামক ব্যাপারটা একটা আইনঘটিত কল্পনায় পরিণত হয়েছে—এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ন্যাশনালিটি জিনিশটাও তা-ই। এই পরিবর্তিত ও পরিবর্তমান পৃথিবী বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তী সুতীক্ষ্ণভাবে সচেতন।'[১১]

রবীন্দ্রনাথ এবং অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতার উপাদান ও বিন্যাসের স্বাতন্ত্র্যও লক্ষ্যযোগ্য। প্রথমোক্তের নায়িকাকে, বহুমুখী ও বিচিত্র রূপান্তর

সত্ত্বেও, নারী হিসেবে চেনা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ, যদিও কাম বিষয়ে সচেতনভাবে পরাঙমুখ, নারীদেহের চমৎকার বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর নির্ভার রোমান্টিক কাব্যজগতে প্রেম একটা 'ভাব' হিসেবে উপস্থিত হলেও সেখানে নারীরূপের চমৎকার বর্ণনায় পাঠক মুগ্ধ হতে বাধ্য। 'মানসসুন্দরী'র নায়িকা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র অর্জন করা সত্ত্বেও তার 'পরিপূর্ণ দেহ/মঞ্জরিত বল্লবীর মতো।' কবি মানসসুন্দরীর সঙ্গ কামনা করেন এভাবে:

অয়ি প্রিয়া
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়োনা গ্রীবাখানি, ফিরায়োনা মুখ
উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি স্তরে স্তরে
সরস সুন্দর; নবস্ফুট পুষ্পসম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধোরো;

রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতায় নারীদেহের বর্ণনা সৌন্দর্যমণ্ডিত। আরো দু'একটি উদাহরণ নে'য়া যাক:

হেলি উর্বশীর স্তনে
স্বর্ণ-বীণা থেকে থেকে যেন অন্যমনে
অকস্মাৎ ঝংকারিত কঠিন পীড়নে।

এবং—

নিদ্রিতা প্রেয়সী
লুন্ঠিত শিথিলবাহু, পড়িয়াছে খসি
গ্রন্থি শরমের---মৃদু সোহাগ চুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর---[১২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এইসব পংক্তিতে 'স্তন', 'শিথিলবাহু', 'গ্রন্থি শরমের' 'সোহাগ-চুম্বন' ইত্যাদি শব্দ ও শব্দবন্ধে নারীদেহের যে বর্ণনা আছে,

তা অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় প্রায় নেই বললেই চলে। তাঁর কবিতায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ নারীদেহ উপস্থিত নেই। পারিপার্শ্বিক পটভূমিসহই সে বাস্তব, বৈশ্বিক পটভূমিতে একজন বাস্তব নারী হিসেবেই তাকে সনাক্ত করা সম্ভব----অথচ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ নারীদেহের বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও তাকে অবাস্তব 'ভাব' মাত্র মনে হয়। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন :

> অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় রক্তমাংসের সংক্রাম সবচেয়ে কম ---এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও 'পবিত্র' তাঁর রচনা ;[১৩]

অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতা-বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর উপর্যুক্ত উক্তি সর্বাংশে সত্য। তবু তাঁর প্রেমের কবিতার নায়িকাকে আমাদের কাছে যে অবাস্তব 'ভাব' মাত্র মনে হয় না, তার কারণ শুধু এই নয় যে তিনি প্রায়ই নায়িকার নাম ব্যবহার করেন। তাকে বাস্তব মনে হবার অন্যতম কারণ হচ্ছে: এই নায়িকা বৈশ্বিক পটভূমিকায় স্থাপিত। বিশেষ দেশে ও কালে, বিশেষ প্রকৃতি ও প্রতিবেশে, বিশেষ নাগরিক আবহাওয়ায় তাঁর রচিত মানব-মানবী পরস্পরকে সংরাগ নিবেদন করে।

বাইরের জীবনের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর ভেতর-জীবনও বস্তু-বিশ্বের ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমান পরিবর্তিত হয়। তাঁর নিজস্ব জীবন স্থিতিহীন, বারে বারে চাকুরী বদলান তিনি, এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভালোবাসেন ঘুরে বেড়াতে—তাহিতি থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় কোন অখ্যাত জেলে-পাড়ায়, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে। ভ্রমণকালীন ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে কবির অন্ত-র্চোখ লেন্সের ঢাকনা খুলে রাখে। বাসা বদল করেন বার বার, বস্তুত আধুনিক মানুষের মতো নিজেকেই বার বার বদলে বদলে নেন :

> দশ মহাদেশ ভাঙে গড়ে দেখি বারবার
> মাটির পৃথিবী জোড়ে আরবার।
> আলো জল হাওয়া মাটি ঢাকে ছবি---
> জীবনের ঘেরে ঘেরে আঁকে ছবি।[১৪]

আধুনিক পৃথিবীর এই ভাঙা-গড়া দেখেছেন কবি দশমহাদেশব্যাপী। মারাত্মক মারণাস্ত্রে আজকের সভ্যতা ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন।

এক একটি যুদ্ধে ব্যক্তি ও পরিবার হচ্ছে ছিন্ন-ভিন্ন---তারই চিত্র এঁকেছেন অমিয় চক্রবর্তী বার বার। বহির্জীবনের প্রবল তাড়নায় আজকের মানুষ ঘরছাড়া, ঠিকানা-বিহীন, উদ্বাস্তু। ডানজিগের মেয়ে আর যুদ্ধতাড়িত ইহুদি পরিবার শান্তি-স্বস্তির জীবন হারিয়েছে। পরিবর্তিত এই জঙ্গম বিশ্বের চিত্র অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় অবিরল। তাঁর প্রেমের কবিতায়ও এই জঙ্গমতা উপস্থিত, স্থির ও স্থায়ী নির্ভার জীবন নেই কারো। দুর্মর বেদনার শিকার তাঁর নায়ক-নায়িকা। রবীন্দ্রনাথে এই জঙ্গম জীবনচিত্র নেই; তাঁর বাস এক স্থায়ী নির্ভার রোমান্টিক আবহে, প্রেম তাই সেখানে ভাবমাত্র: যদিও প্রেম ও বিরহের দুর্মর বেদনার ক্ষেত্রে সমস্ত ভারতীয় কবিমন সমান সাড়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের----

সঘন গহন রাত্রি
ঝরিছে শ্রাবণধারা
অন্ধ বিভাবরী
সঙ্গপরশহারা।

কিংবা—

সেদিন বাতাসে ছিলো তুমি জানো
আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো
তোমার হাসির তুলনা।

---এইসব কবিতাংশে বক্তার অন্তর্ভূমে যে শুদ্ধ বেদনা ও আনন্দ জ্বলে উঠছে তার সঙ্গে আধুনিক কবি-রূপায়িত আনন্দ-বেদনার তফাৎ সামান্যই। উপর্যুক্ত কাব্যাংশে নায়িকার রূপচ্ছবি অস্পষ্ট, কিন্তু অচিহ্নিত নয়। তবু আধুনিক কবিতার নায়িকারা যেখানে বাস্তব বৈশ্বিক পটভূমিতে স্থাপিত, সেখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাস্তব পৃথিবীর ছাপ পড়েছে সামান্যই। প্রথমটিতে একটি সান্দ্র বাদলরাতের ধারাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বক্তার দুঃসহ একাকিত্ব ও নৈঃসঙ্গ্যের বেদনা প্রতিফলিত; দ্বিতীয়টিতে বেদনার অনুভব অমোঘ, কিন্তু তা কোন পরিপার্শ্ব বা পার্থিব অবয়বকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি।

অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতার নায়িকাও প্রায় নিরবয়ব। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার নায়িকার মতোই তাকেও আমরা চোখে

দেখি না, শুধু বাঁশি শুনে আলোড়িত হই; কিন্তু তার উপস্থিতি আমাদেরই চেনা পৃথিবীর পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে, স্টেশনে-জাহাজে। অমিয় চক্রবর্তীর রচনায় জঙ্গম পৃথিবীর তীব্র তীক্ষ্ণ হুইশিল আমাদের কানে বাজে।

সমকালীন কবিদের প্রেমের কবিতার পাত্রপাত্রীরা অমিয় চক্রবর্তীর নায়ক-নায়িকার মতো নির্ভার নিরবয়ব নয়। রক্তমাংসের তীব্র সংরাগ তাদের নায়ক-নায়িকার চরিত্রবৈশিষ্ট্য। নারীর দেহবিষয়ে অমিয় চক্রবর্তীর অনীহা তাঁর সমকালীনদের মধ্যে একেবারে নেই, বরং তাঁদের প্রেমের কবিতা গড়ে উঠেছে রক্তমাংসের বাসনা-সংরাগসহ। দেহনিরপেক্ষ প্রেমের ধারণাটিকেই এঁরা অস্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা-বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য স্মরণ করা যাক:

> তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হ'লো তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে অন্যায়ভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন।[১৫]

প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু মূলত 'প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী' এবং তাঁর 'বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন।'[১৬] বুদ্ধদেবের প্রেমের কবিতায় দেহ তার উষ্ণ উত্তাপ সঞ্চারিত করে দিয়েছে। কারণ তিনি জানেন:

> নতুন ননীর মতো তনু তব? জানি, তার ভিত্তি মূলে
> রহিয়াছে কুৎসিত কংকাল
> (ওগো কঙ্কাবতী)
> মৃত পীত বর্ণ তার: খড়ির মতন শাদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী---
> জানি সে কিসের মূর্তি।[১৭]

দেহকে অবলম্বন ক'রেই, দেহকে সর্বাংশে স্বীকার করেই বুদ্ধদেব তাঁর চমৎকার প্রেম ও সম্ভোগের কবিতায় সঞ্চারিত করেছেন আবেগের উত্তাপ এবং আধুনিক জীবন:

> বক্ষ তব ঢাকিয়া দিনু চুম্বনের ছাপে----
> যুগ্ম সেই অগ্নিগিরি স্পর্শ ভয়ংকর,
> যেখানে প্রেম মৃত্যুহীন রাত্রিদিন কাঁপে।[১৮]

বুদ্ধদেবের কাছে ভালোবাসা মানে বৈরী পৃথিবীর মুখোমুখি জীবনের আনন্দ উপভোগ বা শুদ্ধ জৈবনিক বিশ্বাস। এবং তাঁর মতে :

তবু জৈব জাদু ব্যর্থ নয়
যে-প্রণয়
বিবসন, বিশুদ্ধ, জান্তব
মৃত্যু নেই তার।[১৯]

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় দেহ সম্পর্কে এ-ধরনের সচেতনতা নেই। নারীর রূপ এবং বিশুদ্ধ জান্তব প্রণয় প্রসঙ্গে তিনি একেবারে নিশ্চুপ। তবে নারীর দেহবিষয়ে বুদ্ধদেবের এই সোচ্চার প্রণয়-ঘোষণা তিরিশের অন্য কবিদের মধ্যেও অনুপস্থিত, কিন্তু তাঁরাও কেউ অমিয় চক্রবর্তীর মতো দেহজ প্রেমবিষয়ে বিমুখ নন। বিষ্ণু দে'র প্রেমের কবিতায় আছে বুদ্ধির শাণিত ঔজ্জ্বল্য। হার্দ্য প্রেম ও বেদনার অভাব সেখানেও নেই, কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্ণ বর্শা সেখানে শাসনে রাখে আবেগকে। পরিবর্তিত সমাজ ও জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, টানাপোড়েনে মূল্যবোধের যে পরিবর্তন ঘটে গেছে, বিষ্ণু দে'র প্রেমের কবিতায়ও তা স্পষ্ট। শাশ্বত রোমান্টিক প্রেমধারণা এবং রোমান্টিক স্বপ্নপ্রয়াণ তাঁর কবিতাতেও নেই এবং দেহ-বিষয়ে তিনি অন্যদের মতোই সচেতন। প্রেমের মধুর স্বপ্নে ডুব দিয়ে থাকার সময় তাঁর নেই :

হে উর্বশী,
ক্ষণিকের মর অলকায়
ইন্দ্রিয়ের হর্ষে, জানো, গড়ে তুলি আমার ভুবন
...　　...　　...　　...
তোমার দেহের হায় অন্তহীন আমন্ত্রণ বীথি
ঘুরি যে সময় নেই ;[২০]

বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ প্রেম সম্পর্কে আমাদের পূর্বতন ধারণা যে পাল্টে দিয়েছে বুদ্ধদেবের মতো বিষ্ণু দে'ও এ-বিষয়ে সচেতন এবং বুদ্ধিবাদী কবি প্রেমের হাস্যচপলতা সম্পর্কেও অচেতন নন :

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, লিলি তাই তো আসি
তোমার উষ্ণ প্রেমের হাস্যচপল নীড়ে।[২১]

বিষ্ণু দে অন্যত্র লিখেছেন :

সুযোগ পেয়ে তবে তো
পাশাপাশি মিলি ?
আমাদের ভালোবাসা
প্রাকৃতিক লিলি।[২২]

বর্তমান যুগ ও পরিপ্রেক্ষিতের দাসদাসী বর্তমান মানুষের সঙ্কটচিত্র বিষ্ণু দে'র প্রেমের কবিতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-জড়িত। অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতা অবশ্য এতোটা বুদ্ধিবাদিতা অঙ্গীকার করেনি---যদিও তাঁরও পাত্রপাত্রী আধুনিক, আন্তর্জাতিক পৃথিবীর বাসিন্দা এবং বিচিত্র সঙ্কটে মুহ্যমান।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রেমের কবিতায় স্পষ্টতত ধরা পড়েছে কবির তীব্র অহং এবং তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ববোধ। তাঁর নায়িকাও শরীরিণী, রক্তমাংসের উদ্বেল মানুষ এবং শাশ্বতে অবিশ্বাসী। এই ক্ষণবাদী কবিও সমসাময়িক যুগ-যন্ত্রণাময় জীবনকে পরিপ্রেক্ষিতে রেখেই অনুভবে আনেন প্রেমকে। তাঁর মতে মানব-ইতিহাস মূলত 'সর্বনাশেরই দেশনা'[২৩] এবং সেই সর্বনাশের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ :

আমাদের সাক্ষাৎ হলো আশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়
সমুদ্যত দৈব-দুর্বিপাকে।[২৪]

এই কালপটভূমে শাশ্বত স্মরণ অসম্ভব, চিরপ্রেমও অসঙ্গত এবং দেহের দাবী সংবরণ যে অসাধ্য ও অন্যায় তাও কবির অজানা নয়।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় তীব্র শরীরী প্রেমের এই সংরাগ একেবারে নেই। প্রেমের পশ্চাতে লিবিডোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে, মনে হয়, তার একেবারে সচেতনতা নেই। কিন্তু এ-বিষয়ে, আমার মনে হয়, প্রেমের ভেতরভূমির এইসব শরীরী সংরাগের চতুরালি অমিয় চক্রবর্তী খুব সচেতনভাবেই এড়িয়েছেন। কারণ শরীর বিষয়ে উল্লেখ-মাত্র নেই তাঁর কবিতায়। কিন্তু সমকালীন কবিদের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতার যেখানে সাদৃশ্য, সেটা প্রেমের বেদনার দিকটি। প্রেম যে শাশ্বত নয় এবং আন্তর্জাতিক মানুষ ক্ষণিক প্রেমেরই পূজারী, অমিয় চক্রবর্তী তা জানেন বলেই নশ্বরতা এবং প্রেমের

ক্ষণিকতা বিষয়ে উল্লেখমাত্র করেন না। তাঁর নায়ক-নায়িকা বিচ্ছেদের তীব্র বেদনার শিকার এবং এই বেদনাবোধের অনিবার্য আগ্রাস থেকে সুধীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ দাশের পাত্রপাত্রীরাও রেহাই পায় না। বিরহ বা বিচ্ছেদের তীব্র বেদনার চাপে সুধীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ দাশের পাত্র-পাত্রীরাও দেহ-বিষয়ে অচেতন হয় এবং আক্রান্ত হয় অপার নৈঃসঙ্গ্যে, একাকিত্বের দুর্মর বেদনায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'নাম' কবিতাটি স্মরণ করা যাক :

> চাই চাই আজো চাই তোমারে কেবলই
> আজও বলি
> জনশূন্যতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, আজও বলি---
> অভাবে তোমার
> অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার,
> কাম্য শুধু স্থবির মরণ।
> ... ...
>
> আমার জাগর স্বপ্নলোকে
> একমাত্র সত্তা তুমি, সত্য শুধু তোমরাই স্মরণ।[২৫]

প্রিয়াকে না পাবার বেদনার চাপে নায়িকার শরীর নায়কের স্মৃতি ও চেতনা থেকে অপসৃত হয়েছে। পূর্বতন প্রেমিকা মৃত, নাকি আধুনিক মানবীর মতো প্রাক্তন প্রেম ভুলে এখন অন্য কারো বাহুলগ্ন— এইসব তথ্য পর্যন্ত কবিতায় নেই :

> জানি তুমি মরীচিকা, তোমা সনে প্রাণ বিনিময়
> কোনও দিন হবে না আমার।
> আমার পাতালমুখী বসুধার ভার
> জানি, কেহ পারিবে না ভাগ ক'রে নিতে;
> আমারে নিঃশেষে পিষে, মিশে যাবে নিশ্চিহ্ন নাস্তিতে
> একদিন স্বরচিত এ পৃথিবী মম।[২৬]

প্রিয়ার অভাবে কবির সমস্ত সত্তা-ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে শুদ্ধ বেদনা, তাঁর 'অসহ্য অধুনা', 'ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার' এবং যার জাগর স্বপ্নলোকে একমাত্র সত্তা ছিলো সেই প্রেমিকা, তার নামটিই কেবল স্মরণ করছেন কবি। দেহনিরপেক্ষ যে বেদনাময় প্রেম ভারতীয় মানসকে আমুণ্ডু

অধিকার ক'রে আছে এ-কবিতায় তারই স্পষ্ট পদপাত। বেদনার চাপে ক্লিষ্ট প্রেতপূর্ণ ঘরে কবি শুধু সেই অনুপস্থিত প্রেমিকারই পরাক্রান্ত নাম জপ করেন।

সুধীন্দ্রনাথের মতো এরকম স্পষ্ট সংরাগ নিবেদন অবশ্য অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় নেই। তবু একই ধরনের তীব্র বেদনায় তিনিও আক্রান্ত। ধীর ও অসংলগ্নভাবে কথা বলেন তিনি, আপাত সরল তাঁর উচ্চারণ, মৃদু ও গাঢ়। তাঁর নায়িকার শরীর একেবারে অনুপস্থিত। সুধীন্দ্রনাথের 'নাম' কবিতায় অতীত প্রেমের স্মরণে যে বেদনার ঝড় উঠেছে, অমিয় চক্রবর্তীর 'ওক্লাহোমা' কবিতায় তেমনি বিচ্ছেদ-দিনে ট্রেন-স্টেশন বেদনার ঝড়ে মুহ্যমান :

সাক্ষাৎ সন্ধান এই পেয়েছো কি ৩-টে ২৫-এ ?
 বিকেলের উইলো-বনে রেড-অ্যারো ট্রেনের হুইশিল
 শব্দশেষ ছুঁচে গাঁথে দূর শূন্যে দ্রুত ধোঁয়া নীল;
 মার্কিন ডাঙার বুকে ঝড়ো অবসান গেলো মিশে।।
 অবসান গেলো মিশে ।।

... ...

হৃদপিণ্ডে রক্তের ধ্বনি যেখানে মনের শিরা ছিঁড়ে
 যাত্রী চ'লে গেলো পথে কোটি ওক্লাহোমা পারে লীন,
 রক্ত ক্রুশে বিদ্ধ-ক্ষণে গির্জে জ্বলে রাঙা সে তিমিরে---
 বিচ্ছেদের কল্পান্তরে প্রশ্ন ফিরে আসে চিরদিন ।।
 ফিরে আসে চিরদিন।।[২৭]

সুধীন্দ্রনাথের 'নাম' কবিতার মতোই এখানেও নায়িকা অনুপস্থিত, তবে 'নাম'-এর নায়িকা আগেই দূরবাসিনী, ওক্লাহোমার নায়িকা সদ্য চলে গেলো [যে চলে গিয়েছে সে নায়ক না নায়িকা তা পর্যন্ত অচিহ্নিত]। ট্রেন-স্টেশন থমকে আছে, বেলাশেষের ম্লান বেদনার আলোমাখা উইলো-বন, দ্রুত ধাবমান ট্রেনের হুইশিল অপেক্ষমান নায়কের বুক রক্তাক্ত তীরে বিঁধে গেছে। দূর শূন্যে দ্রুত নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে ট্রেন দয়িতাকে নিয়ে চলে গেছে, আলোড়ন উঠেছে প্রকৃতিতে। তীব্র বেদনার ঝড়ে কবিসত্তার মর্মমূল নড়ে উঠেছে। 'সে' চলে গেছে, মার্কিনী কঠিন ডাঙায় বেদনার ঝড় তুলে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে দয়িতা।

গানের মতো বেজে বেজে উঠছে 'ঝড়ো অবসান গেলো মিশে'র বেদনা-ঝরা পুনরাবৃত্তি। শেষ স্তবকটিতে বেদনাক্রান্ত কবির রক্তাক্ত সত্তা ছিন্ন-প্রায়, গির্জের ক্রূশ শেষ বেলার ম্লান আলোয় রাঙা—কিন্তু কবি নিমজ্জিত 'তিমিরে'। এই 'তিমির' বিচ্ছেদের, এক কল্পান্ত বিরহের।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় আছে এই তীর-তীব্র বেদনার অমোঘ আলোড়ন। কিন্তু তাঁর উচ্চারণ এতো মৃদু ও ভাবনা এতো প্রগাঢ় যে, অসতর্ক পাঠক প্রতারিত হ'তে পারেন। সুধীন্দ্রনাথের পৌরুষ-কণ্ঠ তাঁর নেই, যদিচ দুজনেই একই বেদনার রূপকার। জীবনানন্দ দাশের 'আকাশলীনা'ও প্রায় একই জাতের কবিতা। বেদনার অমোঘ আঘাতে সেখানেও ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে অপার শূন্যতা; 'সুরঞ্জনা'কে একটি তৃতীয় পুরুষের সঙ্গ থেকে নিবৃত্ত হবার আহ্বানের মধ্য দিয়ে রক্তমাংসের সংক্রামসহ মানবিক ঈর্ষাদ্বন্দ্বেই যাত্রা শুরু করেছে কবিতাটি। কিন্তু 'ফিরে এসো হৃদয়ে আমার' এই আর্ত-কাতর ক্লিষ্ট আহ্বানই ধ্বনিত করে তুলেছে বিচ্ছেদবেদনা। এই নায়িকাও দূরবাসিনী এবং 'মৃত্তিকার মতো তুমি আজ' ও 'তোমার হৃদয় আজ ঘাস' পংক্তি দুটি আমাদের মনে সন্দেহ জাগিয়ে দেয় যে নায়িকাটি শুধু দূরবর্তী নয়, সম্ভবতঃ অপার্থিবও। জীবিতই হোক আর মৃতই হোক যে অমোঘ বিচ্ছেদ ঘটে গেছে তার অভিঘাতে এক প্রবল শূন্যতা গ্রাস করেছে বক্তাকে :

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস
বাতাসের ওপাড়ে বাতাস
আকাশের ওপাড়ে আকাশ।[২৮]

একই ধরনের বেদনা-বিম্বিত কবিতা 'হায় চিল' :

তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে রূপ নিয়ে চলে গেছে দূরে
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।[২৯]

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় আবেগ পরিশুদ্ধ হয় বুদ্ধির শোধন-মন্ত্রে, হৃদয়াবেগ ও মননক্রিয়া সেখানে নিরন্তর ক্রিয়াশীল। এক বিশিষ্ট প্রকরণে বিন্যস্ত তাঁর কবিতায় যুগপৎ চৈতন্য ও আবেগের যুগান্তকারী অবলুপ্তি ও নবজাগরণ ঘটে। এ-জন্যেই তাঁর কবিতা পাঠকের জাগরচৈতন্যের মুখাপেক্ষী।

আযৌবন ভ্রাম্যমাণ অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম দিককার কাব্যে প্রেমের কবিতা অত্যল্প। প্রেমের কবিতার এই ধারাটি মূলত শুরু হয়েছে 'পারাপার' (১৩৬০) থেকেই। দশমহাদেশব্যাপী ছড়ানো মানবিক অভিজ্ঞার রূপায়ণও এখান থেকেই পূর্ণতা পেয়েছে। 'অনামী শিল্পের গায়ে বাসনার ধেয়ান'[৩০] মেশানো অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতার রীতি-বৈশিষ্ট্য 'পারাপার' কাব্যের "বিনিময়" কবিতায় স্পষ্ট। দুই স্তবকের ছোট্ট এই কবিতায় বেদনার আগুন খুব অলক্ষ্যে হলেও জ্বলজ্বল করে উঠেছে:

তার বদলে পেলে---
সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর
নীল-বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর
আলোয় ভরা জল----
ফুলে নোওয়ানো ছায়া ডালটা
বেগনি মেঘের ওড়া পালটা
ভরল হৃদয় তল----
একলা বুকে সবই মেলে ॥[৩১]

খুব আকস্মিকভাবে শুরু হয়েছে এই কবিতা। প্রাণরক্তিম উথাল-পাথাল আলোড়ন যে ঘাটে গেছে ইতিমধ্যে, কবি সেই অধ্যায়টুকু রেখেছেন অনুচ্চারিত, গোপন। প্রেমের কবিতায় এই মিতকথন ও সংযম অসাধারণ হয়ে উঠেছে প্রথম পংক্তিতেই একটি উল্লম্ফনের ব্যবহারে। 'তার বদলে' যা পাওয়া গেলো তারই বর্ণনা প্রধান হয়ে উঠেছে কবিতায়। প্রথমেই সেই অমোঘ প্রশ্নের মুখোমুখি হন পাঠক---'কার বদলে? কে সে?' এই প্রশ্নের উত্তরে গভীর প্রান্তদেশে কি অবস্থান করছে না একজন অনুপস্থিত প্রেমিকা-হৃদয়? মনে হয় ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে সেই বেদনার ইতিহাস, অনিবার্যত ঘটেছে বিচ্ছেদ---কবিতার কোথাও যার বর্ণনা নেই। প্রেমিকাকে হারাবার বেদনা ভরাতে এখানে

প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে অনিন্দ্যসুন্দর নিসর্গের রূপপ্রভা। কিন্তু 'একলা বুকে সবই মেলে' পংক্তিটি এক প্রবল অভিঘাতে জাগিয়ে তুলছে পাঠককে। 'শাদা ভাবনা', 'খোলা রাস্তা', 'কান্না-হারা হাওয়া' এবং 'সব-হারানো' শব্দবন্ধগুলো পর পর পাঠককে বিচ্ছেদ-বেদনার আভাস এনে দিচ্ছে। ছোট্ট কমপ্যাক্ট এই কবিতার পংক্তি কটি এক রক্তাক্ত হৃদয়-বেদনারই ব্যঞ্জনা দিচ্ছে।

'বৃষ্টি' কবিতার প্রথম পংক্তিতেই একটি প্রবল অভিঘাত: 'কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে'। এই অভিঘাতে জেগে-ওঠা চৈতন্য অতঃপর বাদলদিনের প্রাত্যহিকতায় ফিরে যায়; কবিবর্ণনায় ফিরে আসে বৃষ্টিবিবিক্ত দিনের শহর, দ্রুত অন্ধকার, এলোমেলো হাওয়া, বিদ্যুৎ-বর্শা এবং 'কালো দিন গলির রাস্তায়।' বিজন-প্রতিবেশে প্রথম পংক্তিটি ঝড়ো দীর্ঘশ্বাসের মতো আবারো উচ্চারিত হয় এবং কবি আবারো ফেরেন বাইরের প্রকৃতি বর্ণনায়। বৃষ্টির অজস্র ধারাবর্ষণ এবং ঘনায়মান অন্ধকারে হাওয়া তার ঘূর্ণিপাকে উচ্চারণ করছে প্রিয়তর সেই নাম:

বলে নাম, বলে নাম অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া
খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।[৩২]

প্রথম পংক্তির 'কেঁদেও পাবে না' এবং উপর্যুক্ত পংক্তির 'খুঁজেও পাবে না' বাক্যাংশ অনিবার্য বিচ্ছেদকে বেদনা-করুণ করে তুলেছে এবং বাদলদিন সেখানে রচনা করেছে একাকিত্বের অন্ধকার। বৈষ্ণব কবিতার পুরোনো ঐতিহ্য-আবহ এ-প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে।

প্রেমের কবিতার ভেতরকার ঐশ্বর্যরাশি মূলত বেদনারই ঐশ্বর্য। অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতার মধ্যেও সেই বেদনার ঐশ্বর্যই ধরা পড়েছে। 'লিরিক' কবিতায় আনন্দ-মিলনের অবসান ঘটলো যে-মুহূর্তে, সেই মুহূর্তেই জন্ম হলো কবিতার:

জানতামই না যখন দুজন, সে তো অনেক দূর;
তারো চেয়ে দূর যে আজ দুপুর।
এক মুহূর্তে ছিন্ন সূতো সমস্ত এই বেলা
অলীক আলোর খেলে খেলা।[৩৩]

এক মুহূর্তে সম্পর্কের সূতো ছিঁড়ে গেলে থাকে কারো জন্যে অপেক্ষার কাল, 'ছায়া-রাস্তা পায়ের শব্দ মিথ্যে গোণে', এবং এই অনিবার্য বেদনার শেষে কবির গাঢ়তম উচ্চারণ:

পৃথিবীতে লগ্ন ছিলো এই মিলনের ঘর,
এসেও ছিলাম দু'জনে---তারপর ?[৩৪]

'এসেও ছিলাম দুজনে' পংক্তির এই অংশটিতে মিলনের প্রত্যাশা যেমন ঝিলিক দিয়ে ওঠে, তেমনি 'তারপর ?' শব্দ ব্যবহারে আমাদের বুঝতে বাকী থাকে না যে বিচ্ছেদ-বেদনা ঘটে গেছে। এই বেদনায়ই স্তব্ধ হয়ে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোন অনামা ট্রেনযাত্রী সৈনিকের বিমুগ্ধ প্রিয়া-স্মরণ :

কোনোদিনই বুঝবো না
কেন ঐ ছেলে তার পকেটে বুকের কাছে রাখে
চুল-ওড়া কার ছবি----
কে যে কাকে কেন প্রাণে ডাকে।
কার মুখ-চোখ কার আলো হ'য়ে ঢেউ তোলে
দেবতা কেন প্রাণে দোলে।[৩৫]

প্রবাসী কার্মেলিতার হৃদয়ে ঢেউ তোলে সেই একই বেদনার সমুদ্র। 'রেস্তোরাঁয় চা নিয়ে ধ্যাননে' কাটে কাল, যোজন যোজন দূর প্রান্ত থেকে বয়ে-আসা বেদনার কান্না-ঢেউ ঝড় তোলে হৃদয়ে :

চলো, কার্মেলিতা, চলো আবার তোমার নিজ দেশে।
এখানে আসবে কাছে স্বপ্ন-চলনের বেশে
কান্না-ঢেউ যোজন যোজন পাড় হ'য়ে
সম্পূর্ণ মিলন পাবে একাসীনা দৃষ্টির প্রত্যয়ে
এ-আসা তো আসা নয়, হঠাৎ যদি বা এই ভিড়ে
বুকের শহর চিরে
শোনো চেনা কণ্ঠ, দেখো চেনা চোখ তবে
মুহূর্তে মূর্ছায় সব শেষ হবে।---
এবারে মিলন শুধু বিরহ উৎসবে।
দুই জন্ম দুই থাক, মধ্যে সাঁকো পারাবার,
কার্মেলিতা, দেখো এক প্রেম-পারাবার।[৩৬]

'পারাপার' কাব্যগ্রন্থের এইসব কবিতাবলিতে গাঢ় বেদনার গোপন কণ্ঠস্বর পাঠক-চেতনাকে মৃদু কিন্তু অমোঘ স্পর্শ করে। ভিন্নতর প্রতিবেশ-পৃথিবী ও আন্তর্জাতিক মানুষের প্রেম-অপ্রেম তাকে নিয়ে যায় নতুন আবহে। কখনো নায়িকা এক আস্বচ্ছ আবরণে লুকিয়ে থাকে, কখনো তার শরীর, নাম ও প্রসঙ্গ একেবারেই থাকে অনুপস্থিত—কিন্তু তার অস্তিত্ব ও বেদনার স্পর্শ অমোঘ।

কাব্যনির্মাণকৌশলের দিক থেকে 'পালা-বদল' অমিয় চক্রবর্তীর নিপুণ ও বিশিষ্ট কলাকৃতির স্বাক্ষর। ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তার যেন নির্ভেদ ঘটেছে এখানে। অন্যান্য কবিতার মতোই প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেও 'পালা-বদল'-এ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষের হৃদয়বেদনা প্রকাশিত। নিয়ত পরিবর্তনশীল জঙ্গম পৃথিবীর বাসিন্দা তাঁর নায়ক-নায়িকা। কোথাও জৈবনিক স্থিতি নেই, স্থিরতা নেই, কোথাও প্রোথিত নেই জীবনের গভীর মূল। কেবল অস্থির চলাফেরা, এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে। ক্রমাগত বাসাবদল ঘটছে মানুষের। কবিতায় অনিবার্যভাবেই তাই আসছে যাত্রার অনুষঙ্গ। এই ক্রমযাত্রা কি শুধু নতুন জীবন ও জীবিকার সন্ধানে? নাকি অস্থিরতায়? নাকি ভেতরকার কোন এক দুর্মর অনিশ্চিতের আনাগোনায় কেবলি উদ্‌ভ্রান্ত চলাফেরা? মনে হয় সবই। আধুনিক জীবনের সমস্ত অনিশ্চিতি ও উৎকণ্ঠা ভর করেছে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায়। তাঁর কবিতাতেও নানা জৈবনিক অসঙ্গতি ও অনিশ্চিতির বিষাদ। অনিবার্যভাবে এমন এক নতুন ও নির্ঘাৎ প্রয়োজন মানুষের ঘটে যায়, যার জন্যে এমন কি জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া ভালোবাসাকেও ছাড়তে হয়। তাই বিচ্ছেদের মুহূর্তগুলো ফিরে আসে কবিতায়। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায়ের বেদনা-অনুষঙ্গ ভারাক্রান্ত করে রাখে কবিতাকে। পরস্পরকে কাছে পেয়েও শান্তি নেই, স্থিতি নেই, কেবলি দূর জগতের অন্যতর হাতছানির অনিবার আকর্ষণ। অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতায় তাই বিচ্ছেদের দৃশ্য রচিত হয় স্টেশনে, বিশেষত ট্রেন-স্টেশনে। 'পারাপারের' "ওক্লাহোমা"র মতো 'পালা-বদল'-এর "অ্যান-আর্বার" কবিতার নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদও ঘটেছে ট্রেন স্টেশনেই। বিরহ-যাত্রার চলতি-দৃশ্য হৃদয়-তন্ত্রীকে কাঁপিয়ে দেয়। দয়িতা স্টেশনে এসেছে প্রিয়তমকে বিদায় জানাতে। ট্রেন শুরু করেছে তার দীর্ঘ যাত্রা। প্রেমিকের সদ্যস্মৃতি, বিদায়মুহূর্তের

বন্ধ চিঠি এখনো হাতে ধরা, এখনো জীবন্ত তার মুখ। কিন্তু বিচ্ছেদের বেদনা এড়াবার উপায় নেই :

ঐ দোলা ডাল থেকে দুদণ্ড উড়েছে শূন্যে পাখি,
এই তো চোখের মগ্ন ছবির অগাধ থেকে ওঠা
জ্বলজ্বল বোঁটা এই মুহূর্তের
ঝরঝর ধোয়া দিন সম্পূর্ণ আবার ভরে আসে---
সাক্ষী সব কিছু----
যেখানে রওনা শুরু তার থেকে ঘড়ি বলে, শুধু
মিনিট খানিকও নয়: দাঁড়িয়েছি একাকিনী তবু
বসেছি পায়ের কাছে ॥[৩৭]

প্রেমিক চলে গেছে মিনিটখানেকও হয়নি, তার স্মৃতি ও বিচ্ছেদের ভার বহন করছে অন্যজন। পাখি তার আশ্রয় বা ডাল ত্যাগ ক'রে নিরুদ্দেশে ওড়লে যেমন তার অস্তিত্ব ও গতির চাপে দুলতে থাকে ডাল, তেমনি একজনের নিরুদ্দেশ-যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের হৃদয় বেদনার চাপে দুলে দুলে উঠছে কবিতায়।

মিলন ও বেদনার যুগপৎ সন্নিপাত ঘটেছে 'রাত্রি' কবিতায়। মৃদু ও গাঢ় উচ্চারণে শেষাবধি বিরহই অবশ্য স্থান ক'রে নিচ্ছে এখানেও :

অতন্দ্রিলা
ঘুমোওনি জানি
তাই চুপি চুপি গাঢ় রাত্রে শুয়ে
বলি. শোনো,
সৌরতারা ছাওয়া এই বিছানায়
---সূক্ষ্মজাল রাত্রির মশারি---
কত দীর্ঘ দু-জনার গেলো সারাদিন,
আলাদা নিশ্বাসে----
এতক্ষণে ছায়া ছায়া পাশে ছুঁই
কী-আশ্চর্য দু-জনে দু-জনা----
অতন্দ্রিলা
হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জ্যোৎস্না
দেখি তুমি নেই ।[৩৮]

মিলনের কবিতা অমিয় চক্রবর্তীর লেখায় বেশি নেই, তবু তা একেবারে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তৎসত্ত্বেও তাঁর প্রেমিক-জুটির বাসা ভেঙে গেছে, উদ্বাস্তুপ্রায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বই তাদের নিয়তি। তাদের মিলনও ঘটে এক কল্পান্ত বিরহবেদনার শেষে। দীর্ঘবিরহ ও দীর্ঘপ্রতীক্ষার পর মিলন অবশ্য নতুন অমরার সন্ধান দেয় :

বারে-বারে ভর-ভর চোখে তাই, নত চেয়ে জানে
যুগ্মতা মিলনাতীত, আনন্দের বিদীর্ণ সন্ধানে---
নির্নিমেষ উদ্বোধিত এক চেতনায় পরস্পরে
দু-জনকে বিশ্বপ্রতীকের সাক্ষী করে,
চূর্ণ বসন্তের নীল ক্ষণে
দিন ধারণার বেশি বিস্মরণে
হঠাৎ প্রাঞ্জল মুগ্ধ আলিঙ্গনে বুঝি ওরা শেষে
সমস্ত অর্পিত সত্যে মেশে ।।[৩৯]

মানব-মানবীর পারস্পরিক প্রেমজ আকর্ষণ চিরন্তন। চির-নতুন ও চির-পুরাতন বিস্ময়ে-আনন্দে প্রেমিকযুগল তাকায় পরস্পরের দিকে। চমৎকার একটি লিরিক-কণিকার দৃশ্যকল্প এরকম :

ছুটে এসে হাতে হাত ধ'রে
ভরা চোখে চেয়ে বলে ছেলে---রিনি
তুমি কি আশ্চর্য ।
মৃদু গাঢ় স্বরে
মেয়ে বলে মাথা নিচু ক'রে
তুমি কি আশ্চর্য।
---- একটি কাহিনী ।[৪০]

অমিয় চক্রবর্তীর এ-ধরনের কবিতায় প্রায়ই আসে স্মৃতির অন্তর-রোমন্থন। কখনো কাহিনীর আভাস এবং কখনো কাহিনীর বিস্তার ঘটেছে। পশ্চিম পৃথিবীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার এতো শিখরস্পর্শী উন্নতি ঘটেছে যে হাজার মাইলের ব্যবধানেও প্রেমিকযুগলের মিলন-চেতনা-স্রোত বদ্ধ হয়না। কারো অন্তরঙ্গ কণ্ঠস্বরের অপেক্ষা ছাড়া গত্যন্তর নেই। টেলিফোনের চেনাকণ্ঠ মনে হয় স্বর্গাগত, দিনটিকে

মনে হয় স্বর্গদিন। সেই কণ্ঠস্বর যেন স্বর্গদিনের বন্ধ কপাট ছুঁয়েছে। তারপর কথা থামলে শুধু বই এবং জানালার বাইরের অরণ্যতট ছাড়া যা অনুরণন তোলে তার নাম বেদনা। কয়েকটি চমৎকার পংক্তি :

টেলিফোনের কুড়িয়ে নেয়া কথার চিহ্ন
হাওয়ায় ওড়া হারা বেলার
হাসি খেলার
পালক, ছিন্ন,
আবার ডোবে নীরবতার অতল তারে।[৪১]

অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতার পাত্রপাত্রী সবাই প্রায়-মার্কিনী অথবা মার্কিন-প্রবাসী। তাঁর কবিতার আবহ যেমন আন্তর্জাতিক, তেমনি পাত্রপাত্রীরাও বিদেশী। শুধু আন্তরধর্মে যেখানে কোন তফাৎ নেই বাঙালি অথবা তৃতীয় বিশ্বের অন্যতর মানুষদের সঙ্গে, সেটি প্রেমের আনন্দ-বেদনা। পশ্চিমী-পৃথিবীর যুবক-যুবতীর প্রাত্যহিক জীবনচিত্র 'নাচঘর' কবিতা। ছাত্র-ছাত্রী দুজন যাচ্ছে নাচঘরে। মেয়েটি 'পুরোনো পশমিনা মুখ আঠারোর করুণায়/অলিভ-লাবণ্য-রঙ, ঝর্ণাচুল/হ'তে পারতো কিয়োটোর, মৃদু সাহসিকা/'।[৪২] ছেলেটি 'মেক্সিকো মূরিস্ স্পেন কিংবা টেক্সাসের 'নীল জীন্-পরা শক্ত যুবা।' দু'জন 'যৌবন-রাজ্যের ধনী' এবং 'হীরের বিদ্যুৎ ঠেকে দুজনের চোখের যাত্রায়।' এটুকুই কবিতা। যেন পথ-চলতি কবি দুজনকে ঢুকতে দেখেছেন নাচঘরে। দুজনের মনোগহনের দৃশ্য দেখছেন তিনি পথের পাশে দাঁড়ানো সাক্ষীর মতো।

'হারানো-অর্কিডে'র লিরিক-কণিকা পর্যায়ের ছোট্ট একটি অসামান্য প্রেমের কবিতা শিরোনামসহ এ-রকম :

এই ডাঙাই ভালো----

"এক তরীতেই ডুবলে দু-জন
এক ঘাটে কি উঠবো ?"
শেষ পর্যন্ত[৪৩]

'সাহিত্যপত্র' দ্বাদশ বর্ষ (১৩৭০) দ্বিতীয় সংখ্যায় এই লেখাটি ছাপা হয়েছিলো এভাবে :

ডাঙাই ভালো"----

"এক তরীতেই ডুবি যদি
এক ঘাটে কি উঠব ?"
"শেষ পর্যন্ত

উদ্ধৃতি-চিহ্নগুলোর ভিন্নতর সংস্থাপন পাঠক লক্ষ্য না ক'রে পারবেন না। এ-প্রসঙ্গে ড. নরেশ গুহের মন্তব্য খুব চমৎকার। "করুণ অথচ সূক্ষ্ম হাস্যোজ্জ্বল দ্বিরালাপের ভঙ্গিতে লেখা একটি প্রেমের কবিতা। ছেদচিহ্নের বৈশিষ্ট্য না মেনে কিংবা একে মুদ্রণপ্রমাদ ভেবে পড়লে তারও একটা মানে নিশ্চয়ই দাঁড়ায়। জয়স্-এর রচনার সঙ্গে পরিচিত পাঠক এতে অবশ্য অন্যরকম মজা এবং ভিন্ন রকমের মানে খুঁজে পাবেন, জানবেন—কবিতার শেষ পংক্তি আসলে শেষ হয়েছে শিরোনামে ফিরে গিয়ে: "শেষ পর্যন্ত ডাঙাই ভালো।"[৪৪] 'সাহিত্যপত্রে'র পাঠটি যে চমৎকার সে-বিষয়ে ড. নরেশ গুহের সঙ্গে পাঠকও একমত হবেন আশা করা অসঙ্গত হবে না। এ-কাব্যের আরো কয়েকটি প্রেমের কবিতা অন্তমিল ও পংক্তিসজ্জার বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট। এদের অন্যতম হচ্ছে 'লিরিক', 'গান' এবং 'ধুলোর ঘরে'। এসব কবিতায় প্রেম এসেছে স্নিগ্ধ সৌন্দর্যকে অঙ্গীকার করে। একটির কিছু অংশ :

ভরে যখন তোমায় ছুঁয়ে সমস্ত বুক
কানায় কানায় হাওয়ায় লাগে বাসন্তী ফাল্গুনী---
তোমাকে পাই ।।
কাকে চাই তা জানি যখন তুমিও চাও
আমাকে এই আলোয় হাওয়ায় দুপুরে পাও---
দু-জনে চাই।
ময়ূরকুঞ্জে ময়ূর ডাকে
বাতাবি-ফুল শাদা সৌরভ ফুটিয়ে রাখে----
লেক-এর জলটা ঝিলমিলিয়ে পাগল বাণী
কাকে চাই তা দু-জন জানি ।।[৪৫]

একই কবিতার শেষ স্তবকের শুরুর দুটি পংক্তিতে প্রেমিক-যুগলের অতিরিক্ত অন্যতর এক 'তিনির' প্রবেশ লক্ষ্যযোগ্য। উদ্ধৃত করা যাক:

কাকে চাই তা চাওয়ান তিনি সৃষ্টি দিয়ে,
জানান হঠাৎ রোদের বেলা বৃষ্টি দিয়ে
বোবা দু-জনে ঝাপসা বুকে কান্না মেশা
কোথায় খুঁজি আরো চাওয়ার আকুল নেশা----
জন্ম-মৃত্যু দূরের দিকে রইলো পড়ে
—দু-জনকে পাই স্বর্গ-জাগাই ধুলোর ঘরে।

অমিয় চক্রবর্তীর দেহ-বিমুখতা, রক্তমাংসের সংক্রমণের অভাব এবং সাড়া-জাগানো 'সংগতি' কবিতা স্মরণে রেখে বুদ্ধদেব বসু তাঁকে 'বাংলাদেশের সবচেয়ে আধ্যাত্মিক কবি'[৪৬] আখ্যা দিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য:

> অমিয় চক্রবর্তীর আধ্যাত্মিকতার বিশেষ লক্ষণ এই যে তা কোথাও কোথাও মিস্টিসিজমের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছয়; বিশেষতঃ তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা অনেক সময় সেই অতিসূক্ষ্ম সীমান্তরেখায় বেপথুমান, যাকে অনুভব করার জন্য প্রায় একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়।[৪৭]

অমিয় চক্রবর্তীর রচনায় আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতি প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী[৪৮] এবং ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান[৪৯] গ্রাহ্য মনে করেন নি। তাঁর কবিতায় হাঁ-ধর্মের প্রাবল্য লক্ষ্য করেছেন বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু যাকে আমরা আধ্যাত্মিক রচনা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি, ঈশ্বর-বিশ্বাসের সেই প্রবল উচ্চকিত ঘোষণা এবং তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় নেই। বিশেষতঃ প্রেমের কবিতা-ক্ষেত্রে তাঁকে আধ্যাত্মিক কবি হিসেবে চিহ্নিত করা চলে না। যদিও "ধুলোর ঘরে" নামক উপর্যুক্ত কবিতা-শরীরে এক অন্যতর 'তিনি' উপস্থিত। এই 'তিনি'-কে 'পরমা'র উপস্থিতি হিসেবে মেনে নিলেও তাঁকে 'আধ্যাত্মিক কবি' হিসেবে চিহ্নিত করা চলে না। কবিতার পটভূমি বৈশ্বিক, প্রথম অংশগুলোতে আনন্দমুখর মিলনচিত্রও উপস্থিত, আর শেষদিকে অন্যতর 'তিনি'র উপস্থিতি আমাদের 'পরমা'র একটি স্পর্শও দেয়। তবুও এ-কবিতায় মাতাল-করা আনন্দ-মিলনে বোবা দু-জনের বোধ শুধু সূক্ষ্মভাবে 'পরমা'কে

স্পর্শ করে যায়। যুক্তিরহিত ও স্বতঃস্ফূর্ত এই পরমার বোধ, ভক্তি-প্রবণ বা সুনীতিনির্ভর নয়। এ-জন্যেই অমিয় চক্রবর্তীকে আধ্যাত্মিক কবি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন নেই। কবিতা-শরীরে 'দুজনকে চাই স্বর্গ জাগাই ধুলোর ঘরে' এই পংক্তি এবং অন্যত্র মিলনের অস্ফুট চাপা আনন্দের ধ্বনিও শোনা যায়। এটি সম্ভবত প্রেমিকা ও মানুষের প্রতি কবির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও বিশ্বাসেরই ফল। বোধ ও প্রজ্ঞার এক রহস্যময় সংগতি যুগপৎ জ্ব'লে উঠেছে কবিতা-শরীরে। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় 'পরমা' তাই, যা রিলকের ভাষায় কোন মন্দিরে 'আহত জন্তুর মতো আবদ্ধ' নয়। 'পুষ্পিত ইমেজ' কাব্যের 'পরিচয়'-এ কবি লিখেছেন :

> অভিযোগের মধ্যে একটি শুনেছি : 'প্রেমের কবিতা' আমার রচনায় বিরল। হয়তো ঠিক অর্থ বুঝি নি, কেননা প্রেম পূজা প্রকৃতি ইত্যাদি বর্ণনা গীতবিতানে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বসালেও বিশেষ কোন ভিন্নতা ধরতে পারিনি। এমন কি যাকে কায়িক, দৈহিক আখ্যা দেওয়া হয়----কবিতার ক্ষেত্রে তার সঙ্গে একান্ত হৃদয়ের কল্পমূর্তি, ইমেজ, মানসীর প্রভেদ আমার কাছে শিল্পিত অর্থে স্পষ্ট নয়। যাই হোক, লৌকিক পদাবলী, প্যাস্টোরাল, পুরোনো এলিজাবেথান লিরিক এবং আধুনিক প্রত্যক্ষ ও প্রতীকে মিশিয়ে কিছু সাময়িক প্রেমের কবিতা গেঁথেছি---সঙ্গে রইলো।

এ-কাব্যের নাম কবিতা "পুষ্পিত ইমেজ" একটি চমৎকার লিরিক। কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক :

মৃদুমুগ্ধ হাসি তার সজল দু'আঁখি
জীবনে-মরণে কাছে রাখি----
ফুলের প্রতিমা সেই ফুলে ফুলে উঠেছে কুসুমি'
　　　　আলোয় আলোয় অঙ্গ চুমি----
　　　　　　চাই তাকে
　　　　দু'জনার নাম-ধরা ডাকে।[৫৩]

প্রেমের কবিতার মধ্যে কয়েকটি রয়েছে চমৎকার কাহিনী-কবিতা। প্রায় সবগুলোর আবহ পশ্চিম-পৃথিবীর। এদের অন্যতম হচ্ছে 'হারানো আর্কিডে'র নাম কবিতা, 'পুষ্পিত ইমেজে'র "পশ্চিম-শহরে"

এবং 'অমরাবতী'র "চতুরঙ্গ"। শেষদিককার কাব্য 'অমরাবতী'তে প্রেমের কবিতা খুব একটা নেই।

নিটোল গল্পের ঢঙে বলা "হারানো অর্কিড" কবিতায় প্যারীর জীবন ও প্রেমের নিবিড় বর্ণনা রয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছাত্র আদ্রেঁ প্যারীর রাত্রিকালীন আলো-উজ্জ্বলতা, সুখৈশ্বর্য, তুমুল কাফে-সুড়িখানা সমস্ত ফেলে নিজের বাড়ির ছাতে উঠে যায় দূরবীন হাতে। মানুষী অহমিকা ও প্যারীর বিলাস-বৈভব এ-কবিতার পাত্র-পাত্রী আদ্রেঁ ও রেণের মধ্যে একেবারে নেই। দুজনের মধ্যেকার প্রেমের উন্মেষ বর্ণনা করেছেন কবি। প্রেমের সঙ্গে আধুনিক জীবন ও বিজ্ঞান এখানে নতুন আয়তন পেয়েছে। আদ্রেঁ একা----

ফেলে যায় প্যারিসের নকশা গলি গ্যাসপোস্ট, ক্রমে
সমস্ত ফ্রান্সের ব্যষ্টি, য়ুরোপ, শেষ চক্ষে তার
ভূলুন্ঠিত এই ছায়া ধরণীর, চেনার উড়ুনি
অন্তর্হিত বিন্দু কাঁচে---;[৫১]

ছাতে উঠে এসে লম্বা-ল্যাজ রূপোলি জড়ির ইঁদুর নিয়ে পরিহাস করে রেণে, তারপর দুজন খেতে যায় রেস্তোঁরায়। পথে ফুলের দোকান থেকে আদ্রেঁ কেনে সবুজ অর্কিড, রেস্তোরাঁয় মোমের একান্ত আলোয় পরায় রেণেকে। রেণে "সেদিন মর্তের ঘরে মানবীর স্বর্গ অধিকার/ স্নিগ্ধ লঘু বয়সের প্রান্তে ধরে।" রেস্তোরাঁ থেকে ফিরতে ফিরতে কোথায় হারায় সবুজ অর্কিড---আর্ত-ব্যাকুল রেণেকে সান্ত্বনা দেয় আদ্রেঁ ----'অর্কিড কখনো হারাবে না'। ছলছল চোখে রেণের বাড়ির কাছে বিদায় নেবার বেলা :

খুশির দু'চোখ আর্দ্র, হাত ধ'রে ফিরে চুপিচুপি
রেণের একটু কথা,----'অর্কিড কখনো হারাবে না।'

সবুজ অর্কিড এখানে প্রেমের সহজ প্রতীক এবং প্রেমিকের উক্তির মধ্য-দিয়েই আমরা বুঝতে পারি তাদের স্নিগ্ধ-গভীর প্রেমকে, যা কখনো হারাবার নয়। এই অর্কিড শান্তি ও মানবিকতারও প্রতীক। কবি লিখেছেন :

আহত পুড়ন্ত ভিয়েৎনামের অরণ্যে চোখে পরেছিলো অনিন্দ্য-সুন্দর বিজয়ী অর্কিড, গাছের ডালে জড়ানো, বর্বর সংঘর্ষের ঊর্ধ্বে। কোনোদিনই হারাবে না।[৫২]

প্রেম, মানবিক সম্পর্ক ও মানবিকতা সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তীর বিশ্বাস দৃঢ়তর। যুদ্ধ ও বর্বরতা সত্ত্বেও মানবিকতা হারাবার নয়।

নিটোল গল্পপ্রধান আর একটি প্রেমের কবিতা "পশ্চিম শহরে"। পশ্চিম-পৃথিবীর নামী শহরের দামী রেস্তোরাঁ 'পিৎসা'য় তিন বন্ধু এসে প্রবেশ করে: গ্রেগরী, সালভেডোরি ও জন। পিৎসার লোভনীয় খাবারের তালিকা ঠেলে দিয়ে জন শুধু কফির অর্ডার দেয়। দুই বন্ধু বিস্মিত এবং জনের ধার্মিকতায় ব্যঙ্গপ্রবণ, তারা বলে:

সাবাস ধার্মিক জন, কৃচ্ছ্র নব্য এ কী----
বড়ো বেশি বৌদ্ধ জেন্ ক্রিস্টীয় মিস্টিক
উন্মার্গ চর্চার ফলে এসেছো গড়িয়ে,----
খাবে না ?[৫৩]

প্রেমে ব্যর্থ, বেদনার্ত জনের বর্তমান সম্বল ধর্ম। শীতার্ত শহর, সাজানো দোকান, ফুলের স্টল, চুলের বিবরণ তার কাছে অর্থহীন এখন। অবাক গ্রেগরী বলে, "সারা বিশ্বে একটির খোঁজে / ট্রলি বাস উঁচু-নিচু পাহাড়তলির/নদী সাঁকো হোটেলের শহর গলির/সবই উবে গেলো?" পশ্চিম-পৃথিবীর রীতি তো এটা নয়। 'তুমি নিঃস্ব' তাই 'পৃথিবী বিফল'? জনের উত্তর : 'স্বর্গে-মর্ত্যে জীবনে চেয়েছি, সালভাডোরি/সৃষ্টি অর্ঘ্য দিতে তাকে।' সেই আনন্দ্য একজন নেই, কি হবে বিলাস বৈভবে? ইতোমধ্যে পিৎসার দোকানের দরোজা খুলে এক দম্পতি এসে ঢোকে এবং এক মুহূর্ত পরেই বাইরে চলে যায়। যাবার আগে জনের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি :

নিমেষ ঝলকে
মেয়েটি ফিরিয়ে চোখ জনকে পলকে
কত যে স্নিগ্ধতা দিলো, নতুন সংসারে
যা পেয়েছে তারই সুধা-ভরা স্মৃতিভারে ;[৫৪]

জন বসে বসে ভাবে:

আত্মসুখ সামান্য জিনিস----
করুণা নিঃসৃত ধন্য সারা প্রাণ ছেয়ে
যে আনন্দ পরমা'র, তারই স্পর্শ পেয়ে

স্নাত আমি, মনে মনে বলে---অহর্নিশ
তৃপ্ত তোমরা শুদ্ধ করো সংসারের বিষ
একই পথে চলি আমরা।

প্রেমিক জনের মধ্য পরমার এই বোধ ও বিশ্বাস অমিয় চক্রবর্তীর শেষদিককার কবিতাতেও কিছুটা এসেছে।

'অনিঃশেষ' কাব্যগ্রন্থে প্রেমের কবিতা খুব একটা নেই। "অতলান্তিক" কবিতায় শুধু বিচ্ছেদবেদনার একটি গভীর রেশ বর্তমান। অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের কবিতা রূপ দেয় দুঃখের অশ্রুকে; তবে এই দুঃখের অশ্রু অন্য সমস্ত প্রেমের কবিতার মতোই আনন্দ-উৎসবে পরিণত হয়। তিন পংক্তির একটি চমৎকার কবিতা উদ্ধৃত ক'রে বর্তমান আলোচনা সমাপ্ত করা যাক:

দুঃখাশ্রুকে রূপ দেয়া বরফ জমিয়ে,
সেই শুভ্রতায় জ্যোস্না ধরা,
—রাত্রে তাই চেয়ে দেখা॥

তথ্যনির্দেশ

১ বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৯ পৃ. ৯৬-৯৭

২ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'স্থির বিষয়ের দিকে', আশা প্রকাশনী, ১৯৭৬, পৃ. ১৩৬

৩ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, "সূর্যাবর্ত" 'কুলায় ও কালপুরুষ', সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৪, পৃ. ৬৬

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পূর্বকালে" 'মানসী'

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অনন্ত প্রেম" 'মানসী'

৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ধ্যান" 'মানসী'

৭ অমলেন্দু বসু, 'সাহিত্যচিন্তা', সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৩৭৯। পৃ. ১৯৪-১৯৫

৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পূর্বকালে" 'মানসী'

৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "মানসসুন্দরী" 'সোনার তরী'

১০ বুদ্ধদেব বসু, 'কবি রবীন্দ্রনাথ', ভারবি, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ৩৭।
১১ বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল' পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২
১২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "স্বর্গ হইতে বিদায়" 'চিত্রা'
১৩ বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল'. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১
১৪ অমিয় চক্রবর্তী, কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৭, পৃ. ১৬৬
১৫ বুদ্ধদেব বসু, 'সাহিত্যচর্চা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ১২৬
১৬ ঐ, কবিতা সংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা পৃ. ৩৪-৩৫
১৭ ঐ, কবিতা সংগ্রহ-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮
১৮ ঐ, ''দময়ন্তী," দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা'
১৯ ঐ,
২০ বিষ্ণু দে, 'উর্বশী ও আর্টেমিস', "উর্বশী"
২১ ঐ, "কণ্ডিশন-রিফ্লেক্স", 'চোরাবালি'
২২ ঐ, 'উর্বশী ও আর্টেমিস', "আত্মজ্ঞান"
২৩ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কাব্য সংগ্রহ, ভারবি, ১৯৬৬, পৃ. ৩১১
২৪ ঐ, পৃ. ১৫২
২৫ ঐ, পৃ. ৩৮
২৬ ঐ, পৃ. ৩৯
২৭ অমিয় চক্রবর্তী, কাব্য সংগ্রহ-১, "ওক্লাহোমা", পৃ. ১৯২
২৮ জীবনানন্দ দাশ, "অকাশলীনা" 'সাতটি তারার তিমির'.
২৯ ঐ, "হায় চিল" 'বনলতা সেন',
৩০ অমিয় চক্রবর্তী, "শিল্প" কবিতা-সংগ্রহ-১, পৃ. ১৮৩
৩১ ঐ, "বিনিময়" পৃ. ১৮৩
৩২ ঐ, ''বৃষ্টি" পৃ. ২৩৭
৩৩ ঐ, "লিরিক" পৃ. ২০৫
৩৪ ঐ, "লিরিক" পৃ. ২০৫
৩৫ ঐ, "ফ্রাইবুর্গের পথে পৃ. ২৩০
৩৬ ঐ, "পরিচয়" পৃ. ১৯৯
৩৭ ঐ, কবিতা সংগ্রহ-২ ''অ্যাব-আর্বার" পৃ. ২৪

৩৮ অমিয় চক্রবর্তী, কবিতা সংগ্রহ-২ "রাত্রি" পৃ. ২৬
৩৯ ঐ, "মিলন দিগন্ত" পৃ. ২৮
৪০ ঐ, "চিরদিনের" পৃ. ৯০
৪১ ঐ "কোণের টেবিল" পৃ. ১০১
৪২ ঐ, "নাচ ঘরে" পৃ. ১৩৫
৪৩ ঐ, "এই ডাঙাই ভালো" পৃ. ১৫২
৪৪ নরেশ গুহ, কবিতা-সংগ্রহ-২, "রচনা পরিচয়" পৃ. ৩২৩
৪৫ অমিয় চক্রবর্তী, কবিতা সংগ্রহ-২, "ধুলোর ঘরে" পৃ. ১৫৮
৪৬ বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল' পৃ. ৯৯
৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৪৮ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, "অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা", 'সাহিত্য পত্রিকা', ষড়বিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, বর্ষা ১৩৯০, পৃ. ১২
৪৯ দীপ্ত ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য-পরিচয়, নাভানা, কলকাতা ১৯৫৮, পৃ. ৩৩৩
৫০ অমিয় চক্রবর্তী, কবিতা-সংগ্রহ-২ "পুষ্পিত ইমেজ", পৃ. ১৮৮
৫১ ঐ, "হারানো অর্কিড", পৃ. ১৭৪
৫২ ঐ; "ভূমিকা, 'হারানো অর্কিড, পৃ. ১২৫
৫৩ ঐ, "পশ্চিম শহরে", পৃ. ১৮৫
৫৪ ঐ, পৃ. ১৮৭